Bodhsandhya

Ninth Edition

নবম বর্ষ
নবম সংখ্যা

প্রকাশক ঃ
বোধসন্ধ্যা
এস-৪৩৯, গ্রেটার কৈলাশ
পার্ট - টু
নিউ দিল্লি - ১১০০৪৮

প্রচ্ছদ
শালিনী

মুদ্রক এবং লেসার টাইপ সেটিং ঃ
আশীর্ব্বাদ প্রিন্ট সার্ভিস
ডি-৬৮৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নয়া দিল্লী-১১০০১৯
দূরভাষ ঃ ২৬২৭৩৮৪৪

মুক্তি

তনুকা এন্ডো ভৌমিক

মা, তুমি চলে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আর পেরে উঠেছিলাম না। তোমার ঘরটায় এখনও ওষুধের গন্ধ লেগে আছে - ঠিক হাসপাতালের মত। রাতদিন তোমার দেখাশুনো, অফিস-বাড়ী সামলানো – আমার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে এরকম কঠিন সময়ের মোকাবিলা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। লক্ষ্মীর মা থাকাতে সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না ঠিকই; কিন্তু সংসারের দায়িত্ব তো আমারই। তোমার ছায়ায় থাকতে থাকতে ভুলে গিয়েছিলাম যে একদিন আমাকেই সব দায়িত্ব বুঝে-শুনে নিতে হবে। শমী তো সেই কত বছর বাড়ীছাড়ী। বউ-বাচ্চা নিয়ে এসে দু-দিন থাকে, আবার চলে যায়। অথচ এ ফ্ল্যাটে ওর থাকার কথা। এত বছর আগে ফ্ল্যাট কেনার সময়ে বাবা আর তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে শমী বিয়ে করে বউ নিয়ে এখানেই সংসার করবে। তোমাদের ভবিষ্যতের ছবির মধ্যে হয়ত আমি নেপথ্যে ছিলাম; অন্য সংসারের গৃহিণী হিসাবে। অথচ কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

বাবা রিটায়ার করার পর পরই হঠাৎ চলে গেল। কয়েক বছরের মধ্যে শমী নতুন চাকরী নিয়ে দিল্লী চলে গেল। বাড়ীতে তখন তুমি, আমি আর লক্ষ্মীর মা। প্রথম প্রথম তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না; মনে হত বাবার আকস্মিক মৃত্যুর ধাক্কাটা বোধহয় কোনদিনই সামলে উঠতে পারবে না। শমীও বাড়ীতে নেই, আমি তো জানি কি টান তোমার ওর উপর। কিন্তু সময় অদ্ভুত জিনিষ; সব ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে যায়। এখন মনে হয় যেন অনন্তকাল ধরে তুমি আর আমি এই বাড়ীটায় থেকে এসেছি। ভুল বললাম, এখন তো তুমিও নেই; এখন আমি একা।

তুমি নেই-ই বা বলি কি করে। প্রতি ঘরে তোমার হাতের ছোঁয়া তোমার শাড়ীগুলো এখনও আলনায় ঝুলছে, চশমাটা টেবিলের উপর, "গীতবিতান" এখনও জানালার পাশে পড়ে আছে। এতগুলো সাদা শাড়ী নিয়ে আমি কি করব? জানি, অফিস থেকে ফিরে মাঝে-মাঝে তোমার গান শুনতে খুব ভাল লাগত। আর কেউ তোমার মত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে না। অনেক কথা ঠোঁটের কাছে এসে পড়ছে – গিলে নিচ্ছি, কাকে বলব? সারাদিনের অফিসের রোজনামচা বলার মত শেষ লোকটাই তো চলে গেল। তবে মৃত্যু তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, কারণ ডাক্তারবাবু বলেছেন যে অসুখটা বাড়লে তোমার কষ্ট আরও বাড়ত। অনেক তো সহ্য করলে আর কেন? আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমিও যেন নতুন করে জীবনটাকে দেখছি। খালি মনে হচ্ছে, আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত সংসারে আর কোন দায়িত্ব রইল না। এবার জীবনটাকে ঠিক নিজের ইচ্ছেমত কাটাতে পারব বা ইচ্ছে হলে বাঁচব না। সিদ্ধান্ত আমার। কোন পিছুটান নেই।

জান', ছোটবেলায় একটা নিটোল জীবনের স্বপ্ন দেখতাম ফ্যানটাসি বলতে পার। একটা ভাল চাকরি করব, নিজের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট থাকবে। সারাদিন খাটার পর বাড়ী ফিরে গা ধুয়ে পরিপাটি হয়ে বসব সোফার উপরে রেকর্ড-প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে ভেসে যাব সুরের ধারায়। আজ ভাগ্যচক্রে ফ্যানটাসির দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছি, কিন্তু আজকের এই বাঁধন ছেঁড়া স্বাধীনতার জন্য কি বড্ড বেশী দাম দিলাম?

বাবা, অশোক, তুমি, প্রত্যেকে আমাকে স্বাধীনতার পথে একটু একটু করে এগিয়ে দিয়েছ। বাবা যখন মারা যায়, আমি তখনও কলেজে। খুব অসহায় লেগেছিল নিজেকে সে সময়ে। মনে হত, এটা বিদেশ হলে নিশ্চয়ই আরও ভাল চিকিৎসা করা যেত, বাবাকে বাঁচাতে পারতাম।

কিন্তু চেষ্টা করার কোন সুযোগই পেলাম না। বুকের ব্যথায় নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হয়ে তিনদিনের মাথায় বাবা চলে গেল। আমার জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। মৃত্যুর মত আশ্চর্য্য জিনিস আগে কখনও দেখিনি। এই বাবা ছিল, এই নেই। মন শক্ত করে তা মেনে নিতে হবে। আবার এ-ও সত্যি যে জীবন অপ্রতিরোধ্য – তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে। পড়াশুনো করে এম.এ. পরীক্ষা দিলাম, ভালভাবে পাশও করলাম। ধীরে ধীরে সর্বগ্রাসী জীবন বাবার মৃত্যুর স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে দিল।

তারপর এল নতুন চাকরির আনন্দ! প্রথম মাসে মাইনে পেয়ে মনে হচ্ছিল যে গোটা পৃথিবীটাকে কিনে নিয়ে তোমার আর শমীর হাতে তুলে দিই। তারপর . . . . অশোকের সাথে আলাপ। তুমি ওকে আমার কলিগ, কি ভাল বন্ধু হিসাবেই জানতে। সন্দেহ মনের কোনে উঁকি দিয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কখনও প্রশ্ন করনি। অফিস থেকে ফিরে রোজকার ঘটনা তোমার কাছে গল্প করা আমার অনেকদিনের অভ্যেস, কিন্তু অশোকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারি নি কখনও।

তুমি একটা কথা বলতে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। অশোকের সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কথাটা বোধহয় খাটে। আমাদের বিয়ের প্ল্যানের কথা বাড়ীতে জানাবো স্থির করেছি, এমন সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ল ওর ব্রেনে টিউমার হয়েছে। কিছুদিন ধরেই ওর খুব মাথা ধরছিল, আমরা ভেবেছিলাম চোখ খারাপ হয়েছে। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ওর বাড়ীর লোক স্থির করল যে অপারেশন করাবে। মারা গেল অশোক। ভাগ্যিস তোমাকে কিছু জানাই নি, মিছি মিছি কষ্ট পেতে। অশোক আসত না দেখে জিজ্ঞেস করেছিলে, কিরে অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি। আমি বললাম, ও ব্যাঙ্গালোরে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে কান্নাকাটি করতে দেখে হয়ত ভাবতে আমি অশোককে ভালবেসেছিলাম —ও আমাকে ছেড়ে অন্য শহরে চলে গেল। আমি তোমাকে কি বলব – তখন আমি স্মৃতির সঙ্গে বেঁচে থাকা শিখছি। কিন্তু বলছিলাম না, সময়ের কি মহিমা! অশোককে ছেড়ে বেঁচে থাকাটা এক সময়ে অর্থহীন মনে হত; শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিদিন কষ্ট সহ্য করেছি। অথচ কয়েক বছর বাদে দেখলাম দিব্বি বহাল তবিয়েতে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন কি মোটা হতে শুরু করেছি। অবশ্য একটা পরিবর্তন নিজের ভিতরে অনুভব করছিলাম। কারও সাথে আর জড়াতে চাই না, সময় নষ্ট হয় তাতে। গান, আঁকা, বই এসব নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব না?

ঐ যে টেবিলের উপরে রাখা কাঁচের ফুলদানীর উপর সূর্যের আলোর এসে পড়েছে, ওই আলোয় ঝলমল রঙগুলো ক্যানভাসে ধরা শিখতেই কয়েক বছর লেগে যাবে। এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শুধু ঘর-সংসার, পড়াশুনো আর চাকরির আবর্তে ঘুরে কেটেছে। গান শিখতাম, পড়াশুনোর চাপে থার্ড ইয়ারে পর ছেড়ে দিলাম। বাড়ীতে পেন্সিলে আঁকা আনাড়ী হাতের স্কেচ দেখে প্রশংসা করেছে অনেক, কিন্তু আঁকা শেখার সময় হয়ে ওঠে নি। ভুল করেছিলাম এই ভেবে যে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কই আমাদের জীবনে একটা মানে এনে দেয়। বরং আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার পথে মানুষই চিরকাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশোকের চলে যাওয়াতে বছর কয়েকের জন্য আমার গান, আঁকা সব কিছুর ইচ্ছে চলে গিয়েছিল। তুমিও আমার জীবনকে অর্থ দেবার পথে কম বাধা তৈরী কর নি, মা। ইচ্ছে করলে আঁকার ক্লাসে ভর্তি হতে পারতাম, কিন্তু যাই নি। জানি যে সারাটা দিন তোমার একা একা কাটে। সেই সন্ধ্যেবেলা কখন আমি ফিরব, অফিসের গল্প করব, তোমার নিস্তরঙ্গ জীবনে ছোটখাট ঢেউ-য়ের গল্প শুনব, তার জন্য তুমি অপেক্ষা করে থাক। তাছাড়া গত দু-বছর ধরে তোমার কখনও সর্দিজ্বর, কখনও হাঁটুতে ব্যথা। মাঝে মধ্যেই ডাক্তার ডাকা, সেবা-শুশ্রূষা। আর বাড়ীর কাজ, এই লাইট খারাপ হয়েছে, মিস্ত্রী ডাকো, পাইপ ফেটে গেছে, প্লাম্বার ডাকো। সব মিলিয়ে আর কতটা

সময় নিজের জন্য বাঁচাতে পারতাম এত করেও তো তোমাকে ধরে রাখতে পারলাম না। তবে এতগুলো বছর কিসের জন্য ব্যয় করলাম? যাক, এখন আর এসব ভেবে কাজ নেই। বাকী জীবনটা নিজের মত করে কাটাব —আর কাউকে দখল নিতে দেব না।

-দুই-

মা, একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। শমীর বউ মানসী স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে খুব চোট পেয়েছে। শমীরও লেগেছে, তবে অল্প। গতকাল ফোনে শমী খবর দিল। ওদের সমস্যা হয়েছে রুন্টুকে নিয়ে। মানসীকে দেড়-দু'মাস খুব সাবধানে থাকতে হবে, যতক্ষণ না ডাক্তার ছাড়পত্র দিচ্ছেন। ঐ এক বছরের ছোট্ট বাচ্চাকে ততদিন কে দেখাশুনো করবে? দিল্লীতে সেরকম বিশ্বাসী আয়ার সন্ধানও ওদের জানা নেই। শমীর ইচ্ছে আমার কাছে রুন্টুকে দু'মাস রেখে দেয়। দিনের বেলা লক্ষ্মীর মা দেখাশুনো করবে। শমীর মুখের দিকে চেয়ে আমি না করতে পারলাম না, যদিও ভিতরে ভিতরে খুব রাগ হচ্ছিল। আমার কি নিজস্ব জীবন বলে কিছু নেই? যে যখন ইচ্ছে এসে আমার সময়ের উপর ভাগ বসাবে? বাচ্চা মানুষ করার আমি জানিই বা কি? তার উপর এটুকু পুঁচকে বাচ্চা।

আজ তুমি থাকলে এত চিন্তা করতে হত না। রুন্টুর ভার তোমার উপরে তুলে দিয়ে আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হতাম। আশ্চর্য, বই-পড়া বিদ্যে আমাদের এত, অথচ একটা ছোট, মানুষের ভার তুলে নিতে আমরা কত ভয় পাই! তোমরা কি জীবনকে অনেক বেশী কাছের থেকে দেখেছিলে? জীবনের মুখোমুখি হতে তোমাকে ভয় পেতে দেখি নি কোনদিন। অথচ আমি, উচ্চশিক্ষিতা, ভাল মাইনের সরকারী চাকুরে, একটা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিতে কুঁকড়ে যাই। আসলে দায়িত্ব নেবার ঝঞ্ঝাট অনেক বাবা, তুমি, অশোক, তোমরা সকলে আমাকে যে স্বাধীনতার স্বাদ দিয়ে গেছ, তা খোয়াতে চাই না।

-তিন-

মা, অনেকদিন বাদে তোমার সাথে গল্প করছি। আমার পরের কথাটা শুনলে তুমি নিশ্চয় মুখ টিপে হাসবে। মা, আমি হেরে গেলাম। জানতে নিশ্চয়ই যে এটাই হবে? একটা খুদে মানুষ আমাকে অক্লেশে হারিয়ে দিল।

রুন্টু কেমন ছেলে? দেখতে কিরকম? বিশেষ কিছুই না। আর পাঁচটা বাচ্চার মত। শ্যামলা গায়ের রঙ, কোঁকড়া চুল বড় বড় চোখ মেলে যেন সারা পৃথিবীর ছবিটা ধরে রাখতে চাইছে। কিন্তু আর পাঁচটা বাচ্চার তো আমাকে প্রয়োজন নেই —রুন্টুর আছে। ওর ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে আমাকে কিভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, তোমাকে বোঝাতে পারব না। অবশ্য শমী আর আমাকে জন্ম দিয়েছ, বড় করেছ, তুমি আমার থেকে ঢের ভাল বুঝবে।

আমাদের বাড়ীতে প্রথম দিন এসেই রুন্টু আমার কোল ভাসিয়ে দিল। কি বিরক্তি। এই কাচাকাচি, জল ঘাঁটার পালা শুরু হল, ভাবলাম মনে মনে। রুন্টুর খাওয়া-দাওয়া ঘুমোনোর রুটিন বুঝিয়ে দিয়ে ওকে আমার আনাড়ী হাতের জিম্মায় রেখে চলে গেল শমী। একটা ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়ায় বিরক্তই লাগছিল প্রথমদিকে। সব হিসেব ওলটপালট করে দিল রুন্টু নিজে। ছেলেটা! দু-তিনদিন অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থাকার পরই আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল যেন আমি ছাড়া ওর কেউ নেই। আমার গলা শুনলে চারখানা দাঁত বার করে হাঁসে, ছোট্ট ছোট্ট হাত বাড়িয়ে দিয়ে উঠতে চায় আমার কোলে। সবথেকে ভাল ওর হাসিখুশী স্বভাব; মোটে কান্নাকাটি করে না।

পরশু অবশ্য, জানি না কেন, হঠাৎ খুব কান্নাকাটি করল। সেদিন ছিল অশোকের মৃত্যুদিন। সকাল থেকেই মন ভার-ভার লাগছিল, তীব্রভাবে মনে পড়ছিল অশোকের কথা। মনে পরছিল আমাদের কথা যেন শেষই হতে চাইত না। কখনও ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কখনও গান-কবিতার গল্প, রোজকার খুঁটিনাটি, অফিস পলিটিক্স, সব নিয়েই আড্ডা

জান মা, এত বছর হল অশোক নেই, অথচ পরশু সারা দিন মনটা হু-হু করছিল ওকে একটু কাছে পাবার জন্য। অফিস থেকে বাড়ী ফেরার মন ছিল না, সারাটা সন্ধে যেন একটা লম্বা ফাঁসের মত সামনে এলানো। বাড়ী ঢুকতেই দেখি লক্ষ্মীর মা'র এলো ঝেলো অবস্থা; রুন্টুর কান্না নাকি কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। আমি অবাক — ওকে তো একনাগাড়ে কখনও এরকম কাঁদতে দেখিনি। অফিসের শাড়ী ছাড়ারও সময় পেলাম না; তাড়াতাড়ি রুন্টুকে কোলে নিয়ে লক্ষ্মীর মা'কে নিশ্চিন্ত করলাম। মনে আশঙ্কা; সেরকম সিরিয়াস কিছু হয় নি তো? একবার মনে হল হয়ত খিদে পেয়েছে, কিন্তু না, দুধের বোতল মুখে দিতে কান্না আরও বেড়ে গেল। গরম লাগছে ভেবে জানলা ভাল করে খুলে পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। তাও কান্না থামে না। তারপর একটু গ্রাইপ ওয়াটার খাইয়ে ওকে কোঁলে করে ধীরে ধীরে ঘরে পায়চারী করতে করতে দেখি আমার কাঁধে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তর্পণে ওকে বিছানায় শুইয়ে তবে আমার ছুটি।

রাত্রে আলো নিভিয়ে শুতে যাবার সময়ে আবার মনে পড়ল অশোকের কথা। আশ্চর্য্য, কি করে এতক্ষণ ভুলেছিলাম! এটাই বোধহয় জীবনের নিয়ম; স্মৃতিকে সম্বল করে তা চলতে পারে না। জীবনের প্রতিভূ ওই ছোট্ট ছেলেটার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবি —কি অসহায় ছেলেটা। জীবনের এত কঠিন বাধার সামনা সামনি করবে কি করে? আর একটু হলেই তো ওর নিরাপদ জীবনের ঘেরাটোপ ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। ঘুমে অসাড় টলটলে মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি, ও সবসময় হাসিখুশী থাকুক। কখনও যেন দুঃখ না পায়। পরক্ষণেই ভাবি, কার জন্য এত ভাবনা - ও তো দু'দিন বাদেই ফিরে যাবে নিজের মা-বাবার কাছে। তারপর আবার সেই বছরে দিনকয়েকের জন্য দেখতে পাবো ওকে! কিন্তু জীবন কবে যুক্তি-তর্কের কথা মেনে চলেছে? ও যে আমাকে আবার ভালবাসতে শিখিয়েছে। ভালবাসায় দুঃখ জড়িয়ে থাকে, জানি, কিন্তু তার মুখোমুখি হবার সাহস আমি পেয়েছি।

তুমি হয়ত ভাবছ, শিকেয় উঠল আমার আঁকা। কত আকাশ-কুসুম কল্পনাই না করেছিলাম বড় আর্টিস্ট হব। অবাক হোয়ো না, আমি আঁকছি। খুব আঁকছি। প্রাণ ভরে আঁকছি। অফিস-বাড়ী-রুন্টু সামলিয়ে যতটুকু সময় পাই, ততক্ষণ আঁকি। কেউ হয়ত এই ছবিগুলো নিয়ে একজিবিশান করবে না, কিন্তু ছবি আঁকার মজার খোঁজটা আমি পেয়ে গেছি। এবার আর জীবনের থেকে পালিয়ে নয়, জীবনকে জড়িয়ে আমি ছবি আঁকব।

আর একটা কথা, মা। এখন থেকে হয়ত তোমারও আর বেশী খোঁজ করব না। জীবনের দাবী তো সবচেয়ে আগে, তাই না? এখন যে আমার সময় বড্ড কম।